জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি

অধ্যাপক গোলাম আযম

জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি

অধ্যাপক গোলাম আযম

আল আযামী পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি
অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনায়
আল আযামী পাবলিকেশন্স
১১৯/২, কাজী অফিস লেন
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৫৩১১৩

স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৫

শব্দবিন্যাস
তাসনিম কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, ঢাকা

মুদ্রণে
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

বিনিময় ঃ ৫.০০ টাকা মাত্র
[খুচরা কোন কমিশন দেয়া হয় না]

JATIO SANGSHADE RAJNAYTICK DALER ANUPATIC PROTINIDHITTOMULOK PADDHATY
by Prof. Ghulam Azam. Published by Al-Azami Publications,
119/2, Kazi Office Lane, Bara Maghbazar, Dhaka-1217, Bangladesh.

Price : 5.00 Only

www.pathagar.com

পুস্তিকার পটভূমি

বিশ্বের বেশ কয়টি দেশে এমন একটি নির্বাচন পদ্ধতি চালু আছে যার ফলে নির্বাচনে টাকার খেলার সুযোগ নেই এবং অর্থশালী না হলেও প্রকৃত যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ রয়েছে। এ পদ্ধতি যে নামে পরিচিত তা হলো ঃ Proportional System of Representation of Political Parties in Parliament (আইন পরিষদে রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি)।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে-এর বর্তমান (২০০৫) সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের রচিত একটি পুস্তিকা ২০০২ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম 'স্থিতিশীল গণতন্ত্র ও সমানুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন'।

কয়েক মাস আগে পত্রিকায় ছোট্ট এক খবরে দেখলাম কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি জনাব মুজাহিদুল ইসলাম আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছেন।

গত ২৭শে এপ্রিল (২০০৫) জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রস্তাব পেশ করেছেন যে, ব্যক্তিকে ভোট না দিয়ে দলকে ভোট দেবার পদ্ধতি চালু হওয়া প্রয়োজন। এ পদ্ধতিরই নাম আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন পদ্ধতি।

১৯৯১ সলের জুন মাসে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় জাতীয় সংসদের নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতাসীন কোন রাজনৈতিক সরকারের পরিচালনায় এমন চমৎকার নির্বাচন কিছুতেই সম্ভব হতো না বলে সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু ঐ নির্বাচনেও প্রার্থীর বিজয়ের প্রধান অবলম্বন ছিল বিরাট অংকের অর্থ। তখন থেকেই আমি ভাবছিলাম যে নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ করতে না পারলে সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নতমানের পার্লামেন্ট গঠন করা অসম্ভব।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি চালু হলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে আমার সুস্পষ্ট ধারণা হলেও বড় দলগুলো এ পদ্ধতি গ্রহণ করবে না বলে আশংকা করে এ সম্পর্কে কিছু লেখা থেকে বিরত ছিলাম। কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি গ্রহণ করতে প্রধান দলগুলোর কমপক্ষে ৭ বছর সময় লেগেছে। ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে জেনারেল এরশাদের সাথে সংলাপের সময় জামায়াত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট ও বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের নিকট কেয়ারটেকার পদ্ধতি দাবি করার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তারা সম্মত

www.pathagar.com

হননি। ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে প্রধান দুটো দল এ পদ্ধতির দাবিতে আন্দোলন করার ফলে ঐ বছরই ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মজবুত ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। আগামী ২০০৭ সালে যে নির্বাচন হবে তাতে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখে আওয়ামী লীগ যত হৈ চৈ-ই করুক তারা কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি বাতিল করে দলীয় সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন দাবি করছে না। কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলই কেয়ারটেকার পদ্ধতি বাতিলের দাবি করছে না।

এ পদ্ধতি শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর কোন সংশোধন দাবি করা যেতে পারে। সংশোধনের পদ্ধতি শাসনতন্ত্রেই দেয়া আছে। এর জন্য জাতীয় সংসদে প্রস্তাব পেশ করতে হবে। তা না করে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ময়দানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। বর্তমান জোট সরকারের মেয়াদ ২০০৬ সালের অক্টোবরে শেষ হলে কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হবে। আওয়ামী লীগ এক্ষুণি জোট সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে। এটা কেমন করে সম্ভব তা বোধগম্য নয়।

যা হোক নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিতেই হবে বলে আশা করা যায়। যেহেতু এ পদ্ধতি বাতিলের দাবি করা হচ্ছে না, সেহেতু এ পদ্ধতি স্থিতাবস্থার মর্যাদা পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অবাধ বলে বিদেশেও স্বীকৃত। এ পদ্ধতির ফলে দলীয় সরকারের পরিচালনায় কারচুপির নির্বাচন থেকে দেশ রক্ষা পেল।

এখন নির্বাচনকে টাকার দাপট থেকে উদ্ধার করার জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি অপরিহার্য। এ পদ্ধতি সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় এখন পর্যন্ত বিতর্ক শুরু হয়নি। তাই এ পদ্ধতিটি সকলের বিবেচনার উদ্দেশ্যে পরিবেশন করছি। কেয়ারটেকার পদ্ধতি বিশ্বে কোথাও না থাকা সত্ত্বেও এদেশে তা চালু হয়েছে। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনেক দেশে চালু থাকায় এটা সকলেরই বিবেচনার যোগ্য বলে আমি মনে করি।

গোলাম আযম
২ মে ২০০৫

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের আনুপতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি

Proportiona' System of Representation of Political Parties in Parliament

বিশ্বে এখনও রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সবাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, শাসিত জনগণের নির্বাচিত হওয়া ছাড়া শাসন করার ন্যায্য অধিকার কারো নেই। মানুষ মানুষের গোলাম হবে কেন? সকল মানুষই স্বাধীন সত্তার অধিকারী। তবে সুশৃংখল সমাজ জীবনের জন্য শাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য।

জনগণের সাম্য ও মৌলিক মানবাধিকার সর্বজনীন অভিমত হিসেবে স্বীকৃত। শাসকগণ প্রভু নয়, জনগণের সেবক। শাসনের সুযোগে শোষণ করার অধিকার মেনে নেয়া চলে না। তাই শাসিতদের সম্মতি নিয়েই শাসনের অধিকার অর্জন করা জরুরি। এ মতাদর্শের নামই গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের প্রধান দাবিই হলো নির্বাচিত সরকার।

নির্বাচনের দাবি পূরণের প্রয়োজনে স্বৈরশাসকরাও নির্বাচনের প্রহসন করে থাকে। তাই যে কোন ধরনের নির্বাচনই গণতন্ত্রের দাবি ও উদ্দেশ্য পূরণ করে না। যে নির্বাচনে জনগণ স্বাধীনভাবে ও অবাধে তাদের রায় প্রকাশ করতে পারে না তা নির্বাচনের নামে প্রতারণা মাত্র।

নির্বাচনের আসল উদ্দেশ্য সফল করতে হলে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে জনমতের সত্যিকার প্রতিফলন ঘটে। তাই নিখুঁত ও ত্রুটিবিহীন পদ্ধতি অপরিহার্য।

নির্বাচন পরিচালকদের পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হওয়া সবচেয়ে জরুরি। বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব ছিদ্রপথ থেকে যায় যার ফলে নির্বাচন অবাধ হতে পারে না।

ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিক ও গণতন্ত্রের বলিষ্ঠ প্রবক্তা জাঁ জাক রুশো লিখেছেন, 'Had there been a state of angels, there should have been perfect democracy' অর্থাৎ নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রায় অসম্ভব। কারণ মানুষ ফেরেশতার মতো নিঃস্বার্থ নয়।

সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের পথে অন্তরায়

যত দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়, সব দেশেই নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হয় না। নিম্নলিখিত কারণে জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পায় না ঃ

১. যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে সে দল সরকারি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে নিজেদের দলীয় প্রার্থীকে অন্যায়ভাবে বিজয়ী করার জন্য নানা অপচেষ্টা চালায়।

২. নির্বাচন কমিশন যে সরকারি কর্মচারীদেরকে রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার হিসেবে কাজে লাগায় তাদের মধ্যে দলীয় সরকারের সমর্থক থাকলে কারচুপি করার সুযোগ গ্রহণ করে।

৩. ভোট প্রার্থীরা বিভিন্নভাবে জালভোট সংগ্রহ করে বিজয়ী হবার অপচেষ্টা করে ঃ

(ক) সন্ত্রাসী জনবল ব্যবহার করে ভোটকেন্দ্র দখল করে ব্যালট বাক্সে জালভোট ঢুকায়।

www.pathagar.com

(খ) ভোটারদের আইডেনটিটি কার্ড না থাকলে আসল ভোটারের নামে নকল ভোটার ভোট চুরি করার সুযোগ পায়।

(গ) ভোট প্রার্থী বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করে বিজয়ী হবার উদ্দেশ্যে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির মাধ্যমে গরীব ভোটারদেরকে টাকার বিনিময়ে ভোট দিতে প্রলুব্ধ করে।

৪. ভোট প্রার্থী কোটি কোটি টাকা খাটিয়ে তাক লাগানো প্রচারাভিযান চালিয়ে সাধারণ ভোটারদেরকে ধাঁধায় ফেলে দেয়। কোন প্রার্থীর অস্বাভাবিক প্রচারাভিযানে প্রভাবিত হয়ে তারই বিজয়ের সম্ভাবনা আছে মনে করে এক শ্রেণীর ভোটার তাকে ভোট দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩-২০০১

বাংলাদেশে ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে যে নির্বাচন হয় তা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় বলে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল নিরংকুশ বিজয় লাভ করে। ১৯৭৩ সালে অল্প কয়টি আসন ছাড়া জাতীয় সংসদের প্রায় সকল আসনই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ কুক্ষিগত করে নেয়। ১৯৭৯ সালে আওয়ামী লীগের মতো সব আসন একচেটিয়া দখল করা না হলেও ক্ষমতাসীন বিএনপি সংসদের দু-তৃতীয়াংশ আসন দখল করে। ১৯৮৬ সালেও এরশাদের জাতীয় পার্টি দু-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হয়। ১৯৮৮ সালে উল্লেখযোগ্য সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচন বয়কট করায় ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি একচেটিয়া প্রায় সব আসন দখল করে নেয়।

১৯৯০ সালে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচনের দাবিতে বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর যুগপৎ আন্দোলনে সৃষ্ট গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরশাসক এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দীন সরকার ১৯৯১ সালের ২৭শে ফ্রেব্রুয়ারি তারিখে সংসদ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করেন। তখন পর্যন্ত কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত না হলেও আন্দোলনকারীদের দেয়া ফর্মুলা অনুযায়ীই কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হয়। ১৯৯৬ সালের ২৬শে মার্চ জাতীয় সংসদে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ঐ পদ্ধতিতেই ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন ৭ম সংসদ ও ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর ৮ম সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত তিনটি নির্বাচনই নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এ তিনটি নির্বাচনে বহু দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষক দল সরেজমিনে নির্বাচন তদারক করে সুস্পষ্ট ভাষায় সার্টিফিকেট দেয় যে নির্বাচন সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি প্রধান দল নির্বাচনে পরাজিত হলে ফলাফল মেনে নিতে প্রস্তুত নয় বলে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করে থাকে। তা না হলে এদেশের ইতিহাসে ঐ তিনটি নির্বাচন মোটামুটি সুষ্ঠু হয়েছে বলে সকল মহলই অকপটে স্বীকার করে।

www.pathagar.com

কেয়ারটেকার পদ্ধতির প্রচলন না হলে

১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত যে তিনটি নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে সেসব নির্বাচন যদি দলীয় সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হতো তাহলে নির্বাচনী ফলাফল কেমন হতো তা স্পষ্ট করেই বলা যায়।

১) ১৯৯১ সালে যদি এরশাদ সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হতো তাহলে এরশাদের জাতীয় পার্টিই ক্ষমতায় টিকে থাকতো। ঐ নির্বাচনে নিরংকুশ না হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে বিএনপি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে ক্ষমতাসীন হয়। ঐ বিএনপি সরকার কেয়ারটেকার পদ্ধতিরই ফসল। এ সত্ত্বেও বিএনপি কেয়ারটেকার পদ্ধতিকে আইনে পরিণত করতে অস্বীকার করে।

বিএনপি ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় নির্বাচন পরিচালনা করে ক্ষমতায় স্থায়ী হতে চেয়েছিল। সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন করা সত্ত্বেও তারা একদলীয়ভাবেই ১৯৯৬ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের অনুষ্ঠান করে। কিন্তু গণআন্দোলনে বাধ্য হয়ে বিএনপি সরকার শাসনতন্ত্রের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সংসদে পাশ করতে বাধ্য হয়।

২) ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ৭ম সংসদের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে এরশাদের জাতীয় পার্টির সমর্থনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়। এ নির্বাচন বিএনপি সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগ কিছুতেই ক্ষমতাসীন হতে পারতো না।

৩) আওয়ামী লীগ সরকার ২০০১ সালের জুনে ক্ষমতা ত্যাগ করলে আবার কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ৪ দলীয় জোট সংসদের দু-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা লাভ করে। এ নির্বাচন যদি আওয়ামী লীগ সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হতো তাহলে ১৯৭৩ সালের মতোই তারা সংসদের প্রায় সকল আসন দখল করে নিতো। আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের জন্য আবার হয়তো একটি আগস্ট বিপ্লবের প্রয়োজন হতো।

সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতার অবসান

নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার যে তালিকা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এর প্রথমটিই হলো দলীয় সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন। কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিতে নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে রাজনৈতিক দলীয় সরকারের পরিচালনায় এদেশে কোন নির্বাচনই অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় তিন তিনটি নির্বাচন সে তুলনায় অনেক সন্তোষজনক বলে বাস্তবে প্রমাণিত এবং দেশে-বিদেশে সমভাবে স্বীকৃত।

নির্বাচন কমিশন যে সব সরকারি কর্মচারী নিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়া চালায় তাদের মধ্যে কিছু লোক দলীয় সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব করার

www.pathagar.com

সুযোগ গ্রহণ করলেও কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় সে সুযোগ গ্রহণ করা স্বাভাবিক নয়। সুতরাং এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে কেয়ারটেকার পদ্ধতি অবাধ নির্বাচনের বিরাট এক প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটিয়েছে।

দলীয় সরকার ও কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানে যে কী বিরাট পার্থক্য তা এ দেশের জনগণ তিনটি নির্বাচনে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। তাই এ পদ্ধতি এত ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে কোন রাজনৈতিক দলই এ পদ্ধতি বর্জনের দাবি করার সাহস করবে না।

স্বাধীন নির্বাচন কমিশন

সকল গণতান্ত্রিক দেশেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে সরকারের সকল প্রকার প্রভাব ও চাপ থেকে মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচন কমিশনের এ মর্যাদা শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্ট থাকাই যথেষ্ট নয়। যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত থাকবে তাদের উপর কমিশনের পূর্ণ ইখতিয়ার থাকা জরুরি।

কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কোন দলের পক্ষে নির্বাচনে কারচুপি করার প্রয়োজন বোধ করা স্বাভাবিক নয়। এ সত্ত্বেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব জিলা প্রশাসকের বদলে জিলা জজের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সাবেক প্রধানগণের অভিমত বিবেচনা করা যেতে পারে।

আসলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ কমিশনের সকল সদস্যকে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হতে হবে। তাদেরকে নিয়োগ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রেসিডেন্টকে জাতীয় সংসদে পার্লামেন্টারী পার্টিসমূহের প্রধানদের সর্বসম্মত অভিমত গ্রহণ করতে হবে যাতে কোন দল পরে আপত্তি করতে না পারে।

সকল গণতান্ত্রিক দেশেই সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদেরকেই নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। আমলাদেরকে এ দায়িত্ব দেবার নজির বিরল।

ভোটারদের পরিচয় পত্র

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা ও ভোটারদের আইডেন্টিটি কার্ড বা পরিচয় পত্র। ভোটার লিস্ট বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও জালভোট বন্ধ হতে পারে না। কিন্তু যদি ফটোসহ পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে জালভোটের কোন সুযোগই থাকে না।

বিচারপতি আবদুর রউফ প্রধান নির্বাচন কমিশনার থাকাকালে ভোটারদের পরিচয় পত্র তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তখনকার তৈরি আমার পরিচয়পত্র এখনও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। অর্থাভাবে নাকি ঐ প্রচেষ্টা স্তব্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

পরিচয়-পত্র তৈরির বিরাট খরচের কথা বিবেচনা করে এ থেকে বিরত থাকা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পরিচয়পত্র নির্বাচন ছাড়াও অনেক কাজে লাগবে। জাতীয় সংসদের নির্বাচন পাঁচ বছরে একবার হলেও ইউনিয়ন পর্যায়ে, উপজিলা ও জিলা পর্যায়ে এবং সংসদের উপনির্বাচনে সারা বছরই পরিচয়পত্র প্রয়োজন। নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে হলে পরিচয়পত্র অপরিহার্য। জালভোটের সুযোগ বন্ধ হলে সকল ভোটারই নিরাপত্তা বোধ করবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ভোট দিতে গিয়ে যখন কোন ভোটার জানতে পারে যে, তার ভোট অন্য কেউ দিয়ে গেছে, তখন কেমন ক্ষোভ বোধ হয়?

পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা হলে ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন প্রার্থীদের এজেন্টদের আসল সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। জালভোট ঠেকানোই তাদের প্রধান কাজ। ভোট দেবার সময় পরিচয়পত্র দেখাতে বাধ্য হলে এজেন্টদের ঐ ঝামেলাই আর থাকবে না।

নির্বাচন ছাড়াও পরিচয়পত্র সর্বক্ষেত্রেই কল্যাণকর হিসেবে গণ্য হবে। পরিচয়পত্র সঙ্গে থাকলে দুর্ঘটনার সময় কাজে লাগবে। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ধোকা দেবার সুযোগ থাকবে না। অপরাধী চিহ্নিত করা অত্যন্ত সহজ হবে। লেনদেন নিশ্চিন্তমনে করা যাবে। এমন বহুমুখী উপকারী জিনিসকে অর্থাভাবের দোহাই দিয়ে অবহেলা করা কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না।

নির্বাচনে টাকার খেলা

ইতোপূর্বে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে যে চারটি প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করা হয়েছে এর তৃতীয় ও চতুর্থটির সাথেই অর্থের সম্পর্ক। নির্বাচনে টাকার যে অবাধ খেলা চলে তা গোটা নির্বাচনী পরিবেশকে কলুষিত করে ফেলে। কোন প্রার্থীর অন্যান্য যত যোগ্যতা ও গুণাবলীই থাকুক, তার তুলনায় সকল অযোগ্যতা সত্ত্বেও টাকার জোরে অন্য কোন প্রার্থী বাজিমাত করে ফেলতে পারে।

আমাদের দেশে টাকার খেলা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন যত চেষ্টাই করে তা বাস্তবে কার্যকর করা যায় না। নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনের প্রচারাভিযানে প্রার্থীদেরকে পাঁচ লাখ টাকার বেশি ব্যয় করতে নিষেধ করেছে। সম্ভবতঃ কোন প্রার্থীই এ বিধি মেনে চলেননি। কোন কোন প্রার্থী কোটি টাকাও ব্যয় করেছেন বলে অনেকেরই ধারণা। প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব পেশ করার জন্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে। সকল প্রার্থীই হিসাব দিয়েছেন বটে, কিন্তু অসত্য হিসাব দিতে বাধ্য হয়েছেন। যত বিশাল অংকই ব্যয়িত হোক, হিসেবে পাঁচ লক্ষের বেশি নয় বলে দেখিয়ে দিয়েছেন।

সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীগণ দাবি করেন যে, তারা জনগণের সেবা করার মহান উদ্দেশ্যেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রশ্ন জাগে যে সেবা করার এত গরজ কেন? জনগণ সেবা করার সুযোগ দিলে করবেন। কিন্তু নিজের গাঁটের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সেবা করার সুযোগ চান কেন? আসলে এটাও একটা বড় ধরনের ব্যবসায়

www.pathagar.com

পরিণত হয়েছে। কোটি টাকা খরচ করেও যদি এমপি হওয়া যায়, তাহলে ঐ পজিশনকে কাজে লাগিয়ে হাজার কোটি টাকা কামাই করার সুযোগ পাওয়া যাবে। জনসেবা নয় আত্ম-সেবাই আসল উদ্দেশ্য।

বড় দলের নমিনেশন পাওয়ার কৌশল

টাকার জোরে এমপি নির্বাচিত হওয়া যায় বলে কোন কোন টাকাওয়ালা লোক নির্বাচনকে টারগেট হিসাবে গ্রহণ করে এবং নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপকভাবে নার্সিং (পরিচর্যামূলক ক্রিয়াকাণ্ড) করতে থাকে। টাকা খরচ করে একদল এজেন্ট নিয়োগ করা হয়, যারা নির্বাচনপ্রার্থীকে জনপ্রিয় করার জন্য সারা বছরই প্রচারণা চালাতে থাকে। এলাকায় বিভিন্ন প্রকার জনসেবামূলক কাজে ব্যক্তিগতভাবে টাকা খরচ করে জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। বিভিন্ন সমিতি, ক্লাব ও যুব সংগঠনকে আর্থিক অনুদান দিয়ে তাদের সমর্থন যোগাড় করে। বছরের পর বছর নার্সিং করতে বিরাট অংকের অর্থ লগ্নি করে নির্বাচিত হতে চায়।

আইনসভার সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণের অধিকারী না হয়েও শুধু টাকার জোরে এমপি হবার প্রয়াস চলে। এটাকে তারা একটা ব্যবসা হিসেবেই গ্রহণ করে। এমপি হতে পারলে লগ্নি করা টাকার চেয়েও অনেক বড় অঙ্কের টাকা কামাই করার সুযোগ তারা পেয়ে যায়। নির্বাচনে যে দলের জিতবার সম্ভাবনা আছে মনে করে সে দলেই নির্বাচনের পূর্বে যোগদান করে যাতে এমপি হবার পর সরকারি সুযোগ হাসিল করে আরও বড় লোক হওয়া সহজ হয়।

ক্ষমতাই যে দেশে রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য সেদেশে এ জাতীয় লোক রাজনৈতিক দলের সাথে লবি করে তার অর্থবল ও জনবলের প্রমাণ দিতে পারলে দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে দলে যোগদানের ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকায় যখন ছবি দেখা যায় যে অমুক ব্যক্তি অমুক রাজনৈতিক দলের প্রধানকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন, তখন সহজেই জানা যায় যে ঐ বক্তি আগামী নির্বাচনে ঐ দলের নমিনেশন কিনে নিয়েছেন। এভাবেই নির্বাচনে টাকার খেলা চলে এবং টাকাওয়ালারা এমপি হন।

কোন বড় দলের নির্বাচনী তহবিলে কয়েক কোটি টাকা অনুদান দিয়ে দলের নমিনেশন ক্রয় করার নজির এদেশে যথেষ্ট আছে। টাকার জোরে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা আর যাই হোক দেশ গড়ার আশা করা চলে না।

জাতীয় সংসদের মর্যাদা

জাতীয় সংসদই রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। রাজনীতিই নীতির রাজা। দেশ কোন্ নীতি অনুযায়ী চলবে, দেশের উন্নয়ন কিভাবে হবে, জনগণের প্রকৃত কল্যাণ কেমন করে সাধন করা যাবে, দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবার উপায় কি, বিশ্ব সমাজে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত হতে হলে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে দেশের উন্নতি প্রয়োজন ইত্যাদি বিরাট বিরাট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফোরামই হলো জাতীয় সংসদ।

www.pathagar.com

এসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে সংসদের সদস্যদের মান কেমন হওয়া উচিত তা সহজেই অনুমান করা যায়। যাদের দেশ গড়ার মন-মানসিকতা আছে; যারা মেধা, জ্ঞান ও চরিত্রে সমৃদ্ধ; যারা দেশ, জাতি ও জনগণের সার্বিক উন্নতির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবার জযবা রাখে; ব্যক্তি স্বার্থে যারা রাজনীতি করে না; দেশের স্বার্থ চিন্তা যাদেরকে রাজনীতির ময়দানে নিক্ষেপ করে, তারা যদি জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন তবেই উপরোক্ত মর্যাদার মান যথাযথ রক্ষা পেতে পারে।

বর্তমানে দেশে যে মানের রাজনীতি প্রচলিত রয়েছে তাতে ঐ মানের সদস্যদের নির্বাচিত হবার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই। বর্তমান রাজনীতির লক্ষ্যই হলো ক্ষমতা দখল করা। দেশকে গড়ে তোলা আসল লক্ষ্য নয়। এটা নিছক ক্ষমতার রাজনীতি, দেশ গড়ার রাজনীতি নয়।

যখন সংসদের অধিবেশন চলে তখন সংসদে বিতর্কের মান, সদস্যদের ভাষণের আলোচ্য বিষয়, বিরোধী দলের সদস্যদের আজব আচরণ ইত্যাদি সংসদের উন্নতমানের কোন পরিচয় বহন করে না।

এ পরিস্থিতির জন্য আমাদের দেশের রাজনীতির ধরন ও সংসদ সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতিই প্রধানতঃ দায়ী। দেশ গড়ার রাজনীতির প্রচলন না হলে এবং ব্যক্তিগতভাবে সদস্যদের নির্বাচিত হবার প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে উন্নত কোন পদ্ধতি চালু করা না গেলে জাতীয় সংসদকে যথাযথ মর্যাদায় উন্নীত করা সম্ভব নয়।

প্রার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে বিরাট অংক ব্যয় করতে হয়

প্রচলিত রাজনীতি হলো Power politics বা ক্ষমতার রাজনীতি। দেশ গড়া আসল লক্ষ্য নয়, ক্ষমতাসীন হওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। আর সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার সুযোগ থাকায়ই টাকার খেলা চলে। এ কারণেই আমাদের রাজনীতি চরমভাবে কলুষিত। রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে হলে এবং সংসদের মর্যাদা উন্নত করতে হলে প্রচলিত নমিনেশন পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন অপরিহার্য।

প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী রাজনৈতিক দল নির্বাচনে নমিনেশন দেবার জন্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে। প্রার্থী হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নির্দিষ্ট আসনে দলীয় নমিনেশন পাওয়ার যোগ্যতম হিসেবে প্রমাণের প্রচেষ্টা চালান। নমিনেশন পওয়ার পর প্রার্থী নিজের উদ্যোগেই নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। নির্বাচনী প্রচারাভিযানের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন। দলীয় কর্মীরা তাঁরই অর্থানুকূল্যে প্রচারাভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

নির্বাচনের তারিখের কয়েকদিন পূর্বে প্রার্থী বা তার কোন এজেন্ট সাধারণ ভোটারদের বাড়িতে দোয়া চাইতে যান এবং হাতে একটা খাম ধরিয়ে দেন। খামে থাকে নতুন নোট। ভোটারের অবস্থা অনুযায়ী টাকার অংক বিভিন্ন হয়। অনেক ভোটারই মনে করে যে ভোটের কোন ফলতো আমরা পাই না। নগদ যা পেলাম তা

www.pathagar.com

মন্দ কী? ভোটের জন্য টাকা দেয়া বে-আইনী ও অন্যায় জানা সত্ত্বেও ভোটার নিমকহারামী করা সঠিক মনে করে না, টাকাওয়ালাকেই ভোটটা দিয়ে আসে।

নির্বাচনের দিন তো টাকা খরচের কোন হিসাবই থাকে না। ভোটারদেরকে বাড়ি থেকে আনার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা ও ভোট কেন্দ্রের কাছাকাছি কোন স্থানে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। এ ব্যাপারে নির্বাচনী কর্মীরাও যথেষ্ট আর্থিক সুবিধা অর্জন করে। এটা রাজনৈতিক কর্মীদের আয় রোজগারের মওসুম।

ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থীকে বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করার এ কুপ্রথার দরুণ, টাকার কুমির না হলে শত যোগ্যতার অধিকারী হয়েও কোন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হিম্মত করতে পারে না। কোন যোগ্য প্রার্থীকে দলীয় তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য করলেও টাকাওয়ালা প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে কেমন করে টাকার খেলায় জিততে পারবে?

নির্বাচনের এ জঘন্য কুপ্রথা থেকে মুক্তির কি কোন উপায় নেই? এ জাতীয় অবৈধ ক্রিয়াকলাপ থেকে নির্বাচনকে মুক্ত করতে না পারলে রাজনীতিকে কিছুতেই কলুষমুক্ত করা সম্ভব হবে না এবং সংসদের মর্যাদা উন্নত করার মতো যোগ্য সদস্যদের নির্বাচিত হওয়ার কোন আশাই করা যায় না।

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি দলীয় সরকারের পক্ষপাতিত্ব ও ব্যালট ডাকাতির পথ বন্ধ করতে সক্ষম হলেও টাকার খেলা বন্ধ হয়নি। সুষ্ঠু, অবাধ ও কলুষমুক্ত নির্বাচনের স্বার্থে টাকার খেলা বন্ধ করার উপায় উদ্ভাবন করতেই হবে।

টাকার খেলা বন্ধ করে সত্যিকার যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের উপায়

আমাদের দেশে যে মানের রাজনীতি চালু আছে তাতে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, উন্নত নৈতিক মানের অধিকারী ও শালীন প্রকৃতির রুচিবান লোকেরা রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হতে দ্বিধাবোধ করেন। তদুপরি নির্বাচনে প্রার্থী হলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যা কিছু করতে হয় তাতেও তারা অভ্যস্ত নন। বিশেষ করে টাকার খেলায় প্রতিযোগিতা করার হিম্মত তাদের থাকারই কথা নয়। এর ফলে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সম্মানিত সদস্যগণের মান যেরূপ উন্নত হওয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে না। এ পরিস্থিতিটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হতাশাব্যঞ্জক।

ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থী হওয়া ও নির্বাচনী এলাকা নার্সিং করা ও নির্বাচনী ব্যয়ভার বহন করার যে পদ্ধতি চালু আছে তা অব্যাহত রেখে ঐ বেদনা ও হতাশা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই।

কিন্তু বিশ্বের বেশ কয়টি দেশে এমন চমৎকার একটি বিকল্প পদ্ধতি চালু রয়েছে যা এ জাতীয় কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ঐ পদ্ধতিতে ভোটাররা কোন প্রার্থীকে ভোট দেয় না, রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয়। নির্বাচনে যে কয়টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যার শতকরা যত সংখ্যক ভোট যে দল পায় পার্লামেন্টের আসন সংখ্যার শতকরা ততভাগ আসনে ঐ দল বিজয়ী বলে গণ্য হয়।

www.pathagar.com

যে দল মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩০ ভাগ ভোট পেল সেই দল সংসদের শতকরা ৩০ ভাগ আসনে বিজয়ী বলে ঘোষিত হবে।

নির্বাচনের পূর্বে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী দল সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সদস্য হবার যোগ্য ব্যক্তিদের একটা তালিকা নির্বাচন কমিশনের নিকট পেশ করবে। ঐ তালিকাটিতে দলীয় ব্যক্তিদের নাম যোগ্যতার মানের ক্রম-অনুযায়ী সাজানো থাকবে। দলের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তির নাম প্রথমে এবং ২য় যোগ্য ব্যক্তির নাম ২য় নম্বরে থাকবে। এভাবে দলীয় তালিকাটি তৈরি করে নির্বাচন কমিশনকে দিতে হবে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার পর প্রাপ্ত মোট ভোট সংখ্যার অনুপাতে যে দল যে কয়টি আসনের অধিকারী হয়, নির্বাচন কমিশন দলীয় তালিকার প্রথম থেকে শুরু করে ঐ সংখ্যক ব্যক্তিকে নির্বাচিত ঘোষণা করবে।

সংসদে মোট আসন সংখ্যার সমান সংখ্যক ব্যক্তির নাম তালিকায় থাকাই স্বাভাবিক। কোন দল এর কম সংখ্যক ব্যক্তির তালিকাও দিতে পারে। কোন দল যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটের কম পায় তাহলে সংসদে ঐ দলের কোন প্রতনিধিত্ব থাকবে না। যেমন তুরস্কে মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ১০ ভাগের কম ভোট পেলে কোন দলের প্রতিনিধিত্ব পার্লামেন্টে থাকে না।

এ পদ্ধতির নাম Proportional System of Representation বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি। প্রত্যেক দল প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে সংসদে আসন লাভ করবে।

এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট

১। এ পদ্ধতির নির্বাচনে কোন প্রার্থীকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভোটারদের সমর্থন সংগ্রহ করতে হয় না। তাই ব্যক্তিগতভাবে অর্থ ব্যয় করে নির্বাচিত হবার ঝামেলাও পোহাতে হয় না। ফলে টাকার খেলার কোন সুযোগই থাকে না। অযোগ্য লোকের টাকার জোরে নির্বাচিত হবার জঘন্য প্রথা খতম হয়ে যায়।

২। এ পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলকে দেশ গড়ার নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে জনগণের দরবারে হাজির হতে হয়। ফলে জনগণ বিভিন্ন দলের পরিকল্পনার তুলনামূলক পর্যালোচার মাধ্যমে দেশ গড়ার পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করে। ভোটাররা যে দলের পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বেশি পছন্দ করে সে দলকেই ভোট দেয়। ভোটাররা কোন ব্যক্তিকে নয়, দলকেই ভোট দেয়।

৩। এ পদ্ধতিতে জনগণ কোন দলকে ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে বিবেচনা করে বা কোন নেতাকে ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে সমর্থন করে না। দেশের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কোন্ দলের কোন্ কর্মসূচি রয়েছে তাই বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এতে রাজনৈতিক মান স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হতে থাকে এবং জনগণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। আবেগের চেয়ে যুক্তি ও বুদ্ধি রাজনৈতিক ময়দানে প্রাধান্য লাভ করে।

৪। এ পদ্ধতির নির্বাচনে প্রত্যেক দলের সবচাইতে অধিক যোগ্য ব্যক্তিগণ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। মেধা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবৃত্তিব দিক দিয়ে দেশের

www.pathagar.com

উন্নতমানের নেতৃবৃন্দ পার্লামেন্টে সমবেত হওয়ার ফলে আইন সভার মান অনেক উন্নত হবার সুযোগ হয়।

৫। দেশে যত রকম আদর্শ ও চিন্তাধারার লোক উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বসবাস করে তাদের সবার প্রতিনিধিত্বই পার্লামেন্টে নিশ্চিত হয়। ব্যক্তিকে ভোট দিলে কোন এক চিন্তাধারার লোক আসনে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়ে যায়। কিন্তু ভিন্ন চিন্তাধারা ও আদর্শের লোক কোন আসনেই সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলে তাদের কোন প্রতিনিধিই পার্লামেন্টে পৌছতে পারে না। অথচ জনগণের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য থাকতে পারে। আনুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সকল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিই পার্লামেন্টে নির্বাচিত হতে পারে। এ বিবেচনায় জনগণের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব এ পদ্ধতিতেই সম্ভব। এতে কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীই প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত থাকবে না।

৬। এ পদ্ধতিতে সকল মহলের প্রতিনিধি পার্লামেন্টে উপস্থিত থাকার ফলে রাজনৈতিক বিতর্ক পার্লামেন্টের বাইরে ময়দানে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে না। পার্লামেন্টই সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হবে, ময়দানে অশান্তি সৃষ্টি হবে না।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আজগুবি পদ্ধতি নয়

Proportional System of Representation বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন পদ্ধতি কোন আজগুবি প্রস্তাব নয়। বিশ্বের বহু দেশে এ পদ্ধতি চালু আছে এবং জনগণ এর সুফল ভোগ করছে।

বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড, ইটালি, সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, ইসরাইলে এ পদ্ধতি চালু আছে। গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে এ পদ্ধতি জার্মানী, ফ্রান্স ও তুরস্কে প্রচলিত রয়েছে।

সবক্ষেত্রেই নতুন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে। নির্বাচনের যে পদ্ধতি এ দেশে চালু আছে এর কুফল জনগণ ভোগ করছে। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি নতুন বলেই বর্জনীয় হওয়া সমীচীন হতে পরে না। বহু দেশে যা চালু আছে তা গ্রহণ করার আপত্তি শুধু তারাই করতে পারে যারা বর্তমান নিম্নমানের পদ্ধতির সুবিধাভোগী।

দেশগড়ার পরিকল্পনা বা যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও যারা ক্ষমতার নেশায়ই রাজনীতি করে এবং ক্ষমতায় পৌছার জন্য সব রকম অবৈধ পন্থা যারা প্রয়োগ করতে আগ্রহী তারা এ নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে রাজি নাও হতে পারে। আদর্শ বা নীতি নয়, ব্যক্তির ইমেজই যাদের রাজনৈতিক পুঁজি তারাও হয়তো নতুন পদ্ধতিটি অপছন্দ করতে পারে। যারা উন্নতমানের রাজনীতি চালু করতে আগ্রহী, সংসদে যারা উন্নতমানের নেতৃবৃন্দের সমাবেশ ঘটাতে উৎসাহী, নির্বাচনে টাকার তেলেসমাতী বন্ধ করতে যারা ইচ্ছুক তারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতিকে অবশ্যই উৎসাহের সাথে স্বাগত জানাবেন।

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি কোন দেশে চালু না থাকা সত্ত্বেও আমরা দায়ে ঠেকে তা গ্রহণ করেছি। আর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি বহু দেশে সফলতার সাথে চালু থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করতে আপত্তি থাকার কোন সঙ্গত যুক্তি নেই।

www.pathagar.com

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির সম্ভাব্য সুফল

আমরা ১৯৩৭ সাল থেকে নির্বাচনের যে পদ্ধতিতে অভ্যস্ত তার বদলে নতুন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করতে পারি। নতুন পদ্ধতিতে কোন ত্রুটি নেই এমন দাবি করা ঠিক নয়। কারণ মানব রচিত কোন পদ্ধতিই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত 'অলপ্রুফ' নয়। তাই প্রচলিত ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করে কোনটা অধিকতর গ্রহণযোগ্য তা বিবেচনা করতে পারি।

১। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি অবলম্বন করলে রাজনীতির মধ্যে বিরাট গুণগত পরিবর্তন আসবে। সকল রাজনৈতিক দল জনসমর্থন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দেশ গড়ার পরিকল্পনা রচনার প্রতিযোগিতায় লেগে যাবে। কোন নেতা বা নেত্রীকে দলের একমাত্র পুঁজি হিসেবে তুলে ধরার পরিবর্তে সকল দল দেশকে সর্বদিক দিয়ে উন্নত করার জন্য জনগণের নিকট বাস্তব কর্মসূচি নিয়ে হাজির হতে বাধ্য হবে।

২। রাজনীতির ময়দানে জ্ঞানী, গুণী, নীতিবান, নিঃস্বার্থ চিন্তাশীল, মেধাবী ও চরিত্রবান ব্যক্তিগণ এগিয়ে আসবেন। রাজনৈতিক দলে এ জাতীয় লোকদের কদর বৃদ্ধি পাবে। ধনবল ও জনবলের ভিত্তিতে নমিনেশন দেবার কুপ্রথা দূর হবে। সংসদে প্রতিভাবান লোকদের সমাবেশ ঘটাবার জন্য রাজনৈতিক দলে প্রতিযোগিতা চলবে।

৩। জনগণের প্রতিনিধি হবার গুণাবলী ও যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও যারা রাজনীতিকে ব্যবসা হিসেবে গণ্য করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এলাকায় অর্থ লগ্নি করতে থাকে এবং একদল মাস্তানকে নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে গড়ে তুলে এমপি হবার সাধনায় লিপ্ত হয় তাদের উৎপাত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।

৪। দলকে ভোট দেবার পদ্ধতি চালু হলে কোন ভোটারের ভোটই অর্থহীন হয় না। ব্যক্তিকে ভোট দিলে যে প্রার্থী পরাজিত হয় তার প্রাপ্ত সকল ভোটই কাজে লাগল না। কিন্তু দলকে ভোট দিলে এ দলের প্রাপ্ত সব ভোট মিলে সংসদে কতক প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারে। ব্যক্তিকে ভোট দিলে কিছু সংখ্যক ভোটার মনে করে যে যার বিজয়ী হবার আশা তাকেই ভোট দিব যাতে আমার ভোটটা পচে না যায়। দলকে ভোট দিলে কারো ভোটই পচার আশংকা থাকে না।

৫। প্রচলিতি পদ্ধতিতে কোন দল প্রচুর ভোট পাওয়া সত্ত্বেও ভোট সংখ্যার তুলনায় আসন অনেক কম পেতে পারে। ২০০১ সালের নির্বাচনে প্রায় ১৯৮ আসনে বিজয়ী বিএনপি-এর কাছাকাছি সংখ্যক ভোট পেয়েও আওয়ামী লীগ মাত্র ৫৯টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। আওয়ামী লীগের পরাজিত প্রার্থীরা প্রচুর ভোট পেয়েও অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরেছেন। দলকে ভোট দিলে প্রতি দল প্রাপ্ত মোট ভোট সংখ্যার অনুপাতে আসন লাভ করবে এবং ভোটারদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে।

৬। আনুপাতিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ময়দানে দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচির প্রতিযোগিতা চলবে। রাজনৈতিক দল জনগণকে আঞ্চলিকতা, গোষ্ঠীপ্রীতি ও ব্যক্তিপূজার পরিবর্তে দলীয় আদর্শের দিকে আহবান জানাবে। নির্বাচন অভিযানের সময় দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচির চর্চাই প্রাধান্য পাবে। এতে দেশ গড়ার ব্যাপারে জনগণের উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতার সুযোগ না থাকায় পারস্পরিক বিদ্বেষ, অশালীন সমালোচনা ও সংঘর্ষের কোন আশংকা থাকবে না। গোটা নির্বাচনী পরিবেশ উত্তাপহীন ও ভদ্রজনোচিত থাকবে।

৭। দলকে ভোট দেবার প্রচলন হলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নত হবে। জনগণের নিকট ব্যক্তির চেয়ে দল, দলের কর্মসূচি ও মেনিফেস্টো অধিকতর গুরুত্ব পাবে। দলের নেতৃত্ব ব্যক্তিভিত্তিক না হয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

এ উপমহাদেশে কোন কোন বড় নেতার উত্তরাধিকারীরাই দলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়। নেতার স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা হওয়াই যদি নেতৃত্বের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হয় তাহলে তা রাজতন্ত্রেরই পরিচায়ক। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মেধা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দলের প্রতি অবদানই যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য। দলকে ভোট দেবার পদ্ধতি চালু হলে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য সৃষ্টি হতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। রাজতন্ত্রে ও পরিবারতন্ত্রে উত্তরাধিকারীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন সুযোগ নেই।

একটি মাত্র সমস্যার সমাধান করতে হবে

প্রচলিত পদ্ধতিতে দেশকে সংসদের আসন সংখ্যা অনুযায়ী নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি নির্বাচনী আসন থেকে একজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সদস্য ঐ নির্দিষ্ট এলাকার প্রতিনিধি হিসেবে তার এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখেন এবং এলাকার জনগণ তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট জনপ্রতিনিধির সহযোগিতা দাবি করেন।

দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন হলে জনগণ এলাকাভিত্তিক কোন প্রতিনিধির খেদমত নেবার সুযোগ পাবে না। এ সমস্যার সমাধান ভিন্নভাবে করা সম্ভব।

ইউনিয়ন, উপজিলা ও জিলাভিত্তিক সংস্থার উপর এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হলে এ সমস্যা থাকবে না। আমাদের দেশে উপজিলা পরিষদ গঠনের আইন পাশ হয়েছে। সংসদ সদস্য উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করায় উপজিলা পরিষদের নির্বাচন নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। উপজিলা ও জিলা পরিষদের উপর উন্নয়নের দায়িত্ব বণ্টন করলে সংসদ সদস্যদেরকে এ ঝামেলা না পোহালেও চলতে পারে।

সংসদ সদস্যগণ কোন এলাকার প্রতিনিধি হবেন না। তারা সারা দেশের জনগণের প্রতিনিধি। তারা গোটা দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিয়ে কর্মতৎপর হবেন। অবশ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করার জন্য নির্বাচিত সংসদ সদস্যদেরকে বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। জনগণ তাদের যাবতীয় সমস্যা ইউনিয়ন, উপজিলা ও জিলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট পেশ করবেন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

অধ্যাপক গোলাম আযম রচিত
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

১. বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি
২. ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীন
৩. আসুন আল্লাহর সৈনিক হই
৪. ইসলাম ও গণতন্ত্র
৫. মনটাকে কাজ দিন
৬. শেখ হাসিনার দুঃশাসনের পাঁচ বছর
৭. ২০০১ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি
৮. কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি উদ্ভাবনা, প্রস্তাবনা ও আন্দোলন
৯. জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি

আল আযামী পাবলিকেশন্স
১১৯/২ কাজী অফিস লেন
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭